মানুষের কারণে

উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিলুপ্তি

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

লেখক
নাঈম আহমাদ

ভূমিকা

পৃথিবী এমন একটি গ্রহ, যেখানে কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের ধারায় প্রাণের এক বিস্ময়কর বৈচিত্র্য গড়ে উঠেছে।অণুজীব থেকে বিশাল তিমি, ক্ষুদ্র শৈবাল থেকে সুউচ্চ বৃক্ষ—প্রতিটি জীব পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই বৈচিত্র্য শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করেনি; বরং পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রকে স্থিতিশীল রেখেছে এবং মানুষের অস্তিত্বকে সম্ভব করেছে। আমরা যে অক্সিজেন গ্রহণ করি, যে খাদ্য উৎপাদন করি, যে বিশুদ্ধ পানি পান করি এবং যে পরিবেশে বসবাস করি—সবকিছুই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীববৈচিত্র্যের ওপর নির্ভরশীল।

কিন্তু আজ এই জীববৈচিত্র্য অভূতপূর্ব সংকটের মুখোমুখি।বন উজাড়, অতিরিক্ত শিকার, দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন, আগ্রাসী বিদেশি প্রজাতির বিস্তার এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলে অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী দ্রুত বিলুপ্তির ঝুঁকিতে পড়ছে।অনেক বিজ্ঞানীর মতে, বর্তমান প্রজাতি বিলুপ্তির হার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক হারের তুলনায় বহু গুণ বেশি, যা পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য এবং মানবসভ্যতার ভবিষ্যতের জন্য এক গভীর উদ্বেগের বিষয়। একটি প্রজাতির বিলুপ্তি কখনোই শুধু একটি প্রাণী বা উদ্ভিদের হারিয়ে যাওয়া নয়; এর প্রভাব ধীরে ধীরে পুরো বাস্তুতন্ত্র, খাদ্যশৃঙ্খল, জলবায়ু এবং শেষ পর্যন্ত মানুষের জীবনেও প্রতিফলিত হয়।

এই বাস্তবতা আমাদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরে—উন্নয়ন কি প্রকৃতির ধ্বংসের বিনিময়ে হবে, নাকি মানুষ ও প্রকৃতি সহাবস্থানের একটি টেকসই পথ খুঁজে নেবে? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যেই লেখা হয়েছে "মানুষের কারণে উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিলুপ্তি: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ"।

এই বইয়ে জীববৈচিত্র্যের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, মানবসভ্যতার বিকাশের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক, মানুষের কর্মকাণ্ডে সৃষ্ট বর্তমান সংকট, বিলুপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাস্তব চিত্র, জলবায়ু পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের আধুনিক উদ্যোগ সহজ ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। একই সঙ্গে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র–সবার করণীয় সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

এই বই কেবল বিলুপ্ত প্রজাতির ইতিহাস নয়; এটি মানুষ, প্রকৃতি এবং ভবিষ্যৎ পৃথিবীর পারস্পরিক সম্পর্কের একটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান। আশা করি, বইটি পাঠকদের জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে, বর্তমান সংকটকে গভীরভাবে বুঝতে এবং প্রকৃতি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আরও সচেতন হতে সহায়তা করবে। কারণ পৃথিবী কেবল আমাদের প্রজন্মের নয়; এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং অসংখ্য প্রাণেরও একমাত্র আবাস।

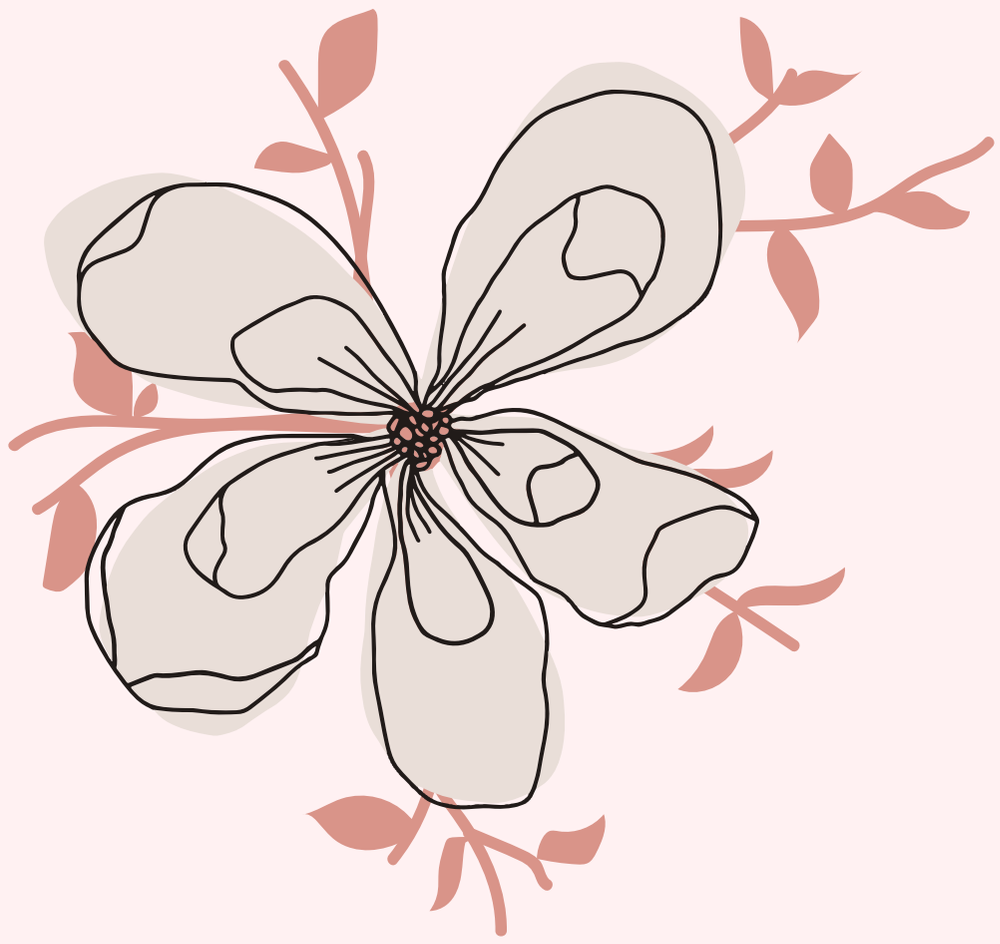

অধ্যায় ১: প্রাণের স্পন্দন ও প্রকৃতির মেলবন্ধন

ভোরের পাখির কূজন, পাতার মর্মর ধ্বনি কিংবা সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন–এসব আমাদের মনে করিয়ে দেয়, পৃথিবী একটি জীবন্ত ও বৈচিত্র্যময় গ্রহ।প্রায় ৪৫০ কোটি বছরের দীর্ঘ ইতিহাসে এখানে অসংখ্য প্রাণী, উদ্ভিদ ও অণুজীবের উদ্ভব হয়েছে। কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের ফলে গড়ে ওঠা এই জীববৈচিত্র্যই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তুলেছে এবং মানুষের অস্তিত্বকে সম্ভব করেছে।

কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে এসে পৃথিবী এক নতুন সংকটের মুখোমুখি।মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে বহু উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজাতি দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে।বিজ্ঞানীদের মতে, বর্তমান প্রজাতি বিলুপ্তির হার প্রাকৃতিক হারের তুলনায় বহু গুণ বেশি।এই পরিস্থিতি শুধু বন্যপ্রাণীর জন্য নয়, সমগ্র বাস্তুতন্ত্র এবং মানবসভ্যতার ভবিষ্যতের জন্যও একটি গুরুতর সতর্কবার্তা।

এই অধ্যায়ে আমরা জানব জীববৈচিত্র্য কী, কেন এটি পৃথিবীর জন্য অপরিহার্য, প্রজাতির বিলুপ্তি বলতে কী বোঝায় এবং কেন বর্তমান যুগে মানুষের কর্মকাণ্ড পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যের সবচেয়ে বড় হুমকিতে পরিণত হয়েছে।

১.১ জীববৈচিত্র্য কী?

জীববৈচিত্র্য বলতে পৃথিবীর সব ধরনের জীব–প্রাণী, উদ্ভিদ, ছত্রাক, অণুজীব–তাদের জিনগত বৈচিত্র্য এবং তারা যে বাস্তুতন্ত্রে বসবাস করে, তার সামগ্রিক বৈচিত্র্যকে বোঝায়।

অর্থাৎ বিশাল নীল তিমি থেকে ক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়া, সুউচ্চ বৃক্ষ থেকে পথের ধারের ছোট্ট ঘাস–সবকিছুই জীববৈচিত্র্যের অংশ।

উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীবের ভূমিকা

- উদ্ভিদ সূর্যালোকের সাহায্যে খাদ্য উৎপাদন করে এবং অক্সিজেন সরবরাহ করে।
- প্রাণীরা খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে শক্তির প্রবাহ ও বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখে।

- অণুজীব মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীকে পচিয়ে পুষ্টি উপাদান পুনরায় মাটিতে ফিরিয়ে দেয়।

এই তিনটি উপাদান একসঙ্গে পৃথিবীর জীবনচক্রকে সচল রাখে।

বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য

প্রতিটি প্রজাতিরই একটি নির্দিষ্ট পরিবেশগত ভূমিকা রয়েছে। কোনো একটি প্রজাতি হারিয়ে গেলে তার প্রভাব ধীরে ধীরে পুরো খাদ্যশৃঙ্খল ও বাস্তুতন্ত্রে ছড়িয়ে পড়ে। তাই জীববৈচিত্র্য রক্ষা মানে শুধু প্রাণী বা উদ্ভিদ রক্ষা নয়; বরং পৃথিবীর জীবনধারণের ভিত্তিকেই সুরক্ষিত রাখা।

১.২ মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক

মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাচীন এবং পারস্পরিক নির্ভরশীল। প্রকৃতি আমাদের অক্সিজেন, খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি, ওষুধ, আশ্রয় এবং জলবায়ুর ভারসাম্য প্রদান করে।অর্থাৎ মানুষের অস্তিত্ব প্রকৃতির সুস্থতার ওপরই নির্ভরশীল।
কিন্তু শিল্পবিপ্লবের পর দ্রুত শিল্পায়ন, নগরায়ণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে মানুষ প্রকৃতিকে সীমাহীন সম্পদের উৎস হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। এর ফলেই বন উজাড়, দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং জীববৈচিত্র্যের অবক্ষয় আজ বৈশ্বিক সংকটে পরিণত হয়েছে।

১.৩ বিলুপ্তি কী?

যখন কোনো নির্দিষ্ট প্রজাতির শেষ জীবিত সদস্যটিও মারা যায় এবং পৃথিবীর কোথাও সেই প্রজাতির আর কোনো জীবিত সদস্য অবশিষ্ট থাকে না, তখন সেই প্রজাতিকে বিলুপ্ত (Extinct) বলা হয়। এই ঘটনাকেই বিলুপ্তি (Extinction) বলা হয়।
একটি প্রজাতির বিলুপ্তি মানে শুধু কয়েকটি প্রাণীর মৃত্যু নয়; বরং কোটি বছরের বিবর্তনের মাধ্যমে গড়ে ওঠা একটি অনন্য জিনগত ঐতিহ্যের চিরস্থায়ী অবসান। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা জিনপ্রযুক্তির মাধ্যমে কিছু বিলুপ্ত প্রজাতিকে আংশিকভাবে পুনর্গঠনের (De-extinction) সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা করছেন।

তবে এখন পর্যন্ত কোনো সম্পূর্ণ বিলুপ্ত প্রজাতিকে তার প্রাকৃতিক পরিবেশে সফলভাবে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি।

১.৪ কেন মানুষের কারণে বিলুপ্তি উদ্বেগজনক?

প্রাকৃতিকভাবে প্রজাতির বিলুপ্তি পৃথিবীর ইতিহাসের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু বর্তমান যুগে মানুষের কর্মকাণ্ডের কারণে বিলুপ্তির গতি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে।

বিলুপ্তির গতি

প্রাকৃতিকভাবে একটি প্রজাতির বিলুপ্ত হতে হাজার থেকে লক্ষ বছর সময় লাগতে পারে। এই সময়ে অন্য অনেক প্রজাতি নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সুযোগ পায়।

অন্যদিকে বন উজাড়, অতিরিক্ত শিকার, দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলে বর্তমান বিলুপ্তির হার প্রাকৃতিক হারের তুলনায় প্রায় ১০০ থেকে ১,০০০ গুণ বেশি বলে বিভিন্ন গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে।

অভিযোজনের সুযোগ কমে যাওয়া

প্রকৃতির পরিবর্তন সাধারণত ধীরে ধীরে ঘটে। কিন্তু মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে পরিবেশ এত দ্রুত বদলে যাচ্ছে যে বহু প্রাণী ও উদ্ভিদের পক্ষে বিবর্তনের মাধ্যমে নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে তাদের বিলুপ্তির ঝুঁকি ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে।

অধ্যায় ২: মানুষের কারণে বিলুপ্তির ইতিহাস

প্রায় ৩ লাখ বছর আগে আধুনিক মানুষ (Homo sapiens) আফ্রিকায় আবির্ভূত হয়। প্রথমদিকে মানুষ ছিল প্রকৃতির অন্যান্য প্রাণীর মতোই একটি প্রজাতি, যার জীবন নির্ভর করত শিকার, মাছ ধরা এবং বুনো ফলমূল সংগ্রহের ওপর।কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বুদ্ধিমত্তা, প্রযুক্তি এবং সংগঠিত সমাজ গড়ে তোলার ক্ষমতা তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী জীব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

এই অগ্রগতির ফলে মানুষ সভ্যতা, কৃষি, চিকিৎসা ও প্রযুক্তিতে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। একই সঙ্গে মানুষের কর্মকাণ্ড পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যের ওপরও গভীর প্রভাব ফেলেছে। বন উজাড়, অতিরিক্ত শিকার, দূষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার বহু প্রজাতিকে বিলুপ্তির মুখে ঠেলে দিয়েছে।

এই অধ্যায়ে আমরা দেখব, কীভাবে মানবসভ্যতার বিকাশের বিভিন্ন ধাপ জীববৈচিত্র্যের ইতিহাসকে বদলে দিয়েছে।

২.১ প্রাচীন শিকারি সমাজ: প্রথম বড় প্রভাব

প্রাচীন মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে শিকারি-সংগ্রাহক (Hunter-Gatherer) হিসেবে জীবনযাপন করত।তারা পাথর, হাড় ও কাঠের তৈরি অস্ত্র ব্যবহার করে শিকার করত এবং ছোট ছোট দলে বসবাস করত।

মানুষ যখন আফ্রিকা থেকে ইউরোপ, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং পরে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে, তখন অনেক অঞ্চলের বৃহদাকৃতির প্রাণী (Megafauna) অল্প সময়ের মধ্যেই হারিয়ে যেতে শুরু করে।

উদাহরণস্বরূপ–

- উলি ম্যামথ (Woolly Mammoth)
- দৈত্যাকার গ্রাউন্ড স্লথ
- অস্ট্রেলিয়ার বিশাল ক্যাঙ্গারু ও মারসুপিয়াল সিংহ

বিজ্ঞানীদের অধিকাংশের মতে, এই প্রাণীগুলোর বিলুপ্তির পেছনে মানুষের অতিরিক্ত শিকার এবং বরফ যুগ-পরবর্তী জলবায়ু পরিবর্তন–উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

উলি ম্যামথ

২.২ কৃষির সূচনা: প্রকৃতির রূপান্তর

প্রায় ১০–১২ হাজার বছর আগে মানুষ কৃষিকাজ শুরু করে। এটি মানব ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন।

কৃষির ফলে–

- বিশাল বনভূমি কেটে কৃষিজমি তৈরি করা হয়।
- প্রাকৃতিক তৃণভূমি ও জলাভূমি চাষের জমিতে রূপান্তরিত হয়।
- হাজারো বন্য উদ্ভিদের পরিবর্তে অল্প কয়েকটি খাদ্যশস্যের চাষ শুরু হয়।
- গৃহপালিত পশুর জন্য চারণভূমি তৈরি করতে বহু বন্য প্রাণীর আবাসস্থল ধ্বংস হয়।

এর ফলে মানুষের খাদ্য উৎপাদন বাড়লেও প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের বৈচিত্র্য ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে।

২.৩ বন উজাড়: সভ্যতার বিস্তারের মূল্য

সভ্যতা যত বিস্তৃত হয়েছে, কাঠের চাহিদাও তত বেড়েছে।

প্রাচীন মিশর, গ্রিস ও রোম থেকে শুরু করে মধ্যযুগীয় ইউরোপ–সব যুগেই জাহাজ নির্মাণ, ঘরবাড়ি, দুর্গ এবং জ্বালানির জন্য বিপুল পরিমাণ বন কেটে ফেলা হয়।

বিশেষ করে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বহু প্রাচীন বনভূমি এই সময়ে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।বন হারানোর সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থলও সংকুচিত হতে থাকে।

২.৪ শিল্পবিপ্লব: পরিবেশ পরিবর্তনের নতুন যুগ

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি ইউরোপে শুরু হওয়া শিল্পবিপ্লব মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা।বাষ্পশক্তি, কয়লা এবং পরে খনিজ তেলের ব্যবহার শিল্পোৎপাদন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিপ্লব ঘটায়।

কিন্তু এর পরিবেশগত মূল্যও ছিল বড়।

- বিপুল পরিমাণ জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা দ্রুত বাড়তে থাকে।
- শিল্পকারখানার বর্জ্যে বহু নদী ও জলাশয় দূষিত হয়।
- খনি, রেলপথ ও নগরায়ণের জন্য ব্যাপক বনভূমি ধ্বংস হয়।

বর্তমান মানবসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের মূল ভিত্তি এই শিল্পায়নের যুগেই গড়ে ওঠে।

২.৫ আধুনিক প্রযুক্তি ও অতিভোগ

বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীতে প্রযুক্তির অগ্রগতি মানুষের জীবনকে সহজ করেছে, কিন্তু একই সঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর চাপও বহুগুণ বাড়িয়েছে।

আজ–

- আধুনিক ট্রলার দিয়ে গভীর সমুদ্র থেকে বিপুল পরিমাণ মাছ ধরা হচ্ছে।
- ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে দ্রুত বন উজাড় করা হচ্ছে।
- প্লাস্টিক, ইলেকট্রনিক বর্জ্য এবং রাসায়নিক দূষণ পরিবেশের জন্য নতুন হুমকি তৈরি করেছে।
- 'ফাস্ট ফ্যাশন'-এর কারণে পোশাক শিল্পে পানি, জ্বালানি ও কাঁচামালের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বেড়েছে।

প্রযুক্তি নিজে ক্ষতিকর নয়; বরং এর অনিয়ন্ত্রিত ও অতিরিক্ত ব্যবহার পরিবেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২.৬ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ভূমির ওপর চাপ

১৮০০ সালের দিকে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১০০ কোটি।বর্তমানে তা ৮০০ কোটিরও বেশি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে–

- নতুন আবাসন নির্মাণ,
- কৃষিজমির সম্প্রসারণ,
- শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা,
- সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ

–এসবের জন্য বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক ভূমি মানুষের দখলে চলে এসেছে।

ফলে বহু বন্যপ্রাণী তাদের আবাসস্থল হারিয়ে ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন এলাকায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে, যা তাদের দীর্ঘমেয়াদি টিকে থাকার জন্য বড় হুমকি।

২.৭ বিশ্বায়ন ও আগ্রাসী বিদেশি প্রজাতির বিস্তার

বিশ্বায়নের ফলে মানুষ ও পণ্যের পাশাপাশি এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে উদ্ভিদ, প্রাণী এবং অণুজীবও স্থানান্তরিত হচ্ছে।

যখন কোনো বিদেশি প্রজাতি নতুন পরিবেশে দ্রুত বিস্তার লাভ করে স্থানীয় প্রজাতির ক্ষতি করে, তখন তাকে আগ্রাসী বিদেশি প্রজাতি বলা হয়।

উদাহরণস্বরূপ–

- জাহাজের সঙ্গে বিভিন্ন দ্বীপে পৌঁছানো ইঁদুর বহু স্থানীয় পাখির ডিম ও ছানা খেয়ে তাদের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছে।
- বিশ্বের অনেক অঞ্চলে বিদেশি কচুরিপানা নদী ও জলাভূমিতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ ও স্থানীয় জলজ জীবের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

- বিভিন্ন অঞ্চলে আনা কিছু বিদেশি উদ্ভিদ ও প্রাণী স্থানীয় প্রজাতির সঙ্গে খাদ্য ও বাসস্থানের প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করেছে।

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

মানুষের ইতিহাস শুধু প্রযুক্তি ও সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস নয়; এটি প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কেরও ইতিহাস। শিকারি সমাজ থেকে কৃষি, শিল্পবিপ্লব থেকে আধুনিক প্রযুক্তি–প্রতিটি ধাপে মানুষের কর্মকাণ্ড জীববৈচিত্র্যের ওপর প্রভাব ফেলেছে। এই ইতিহাস আমাদের শেখায়, উন্নয়ন তখনই টেকসই হতে পারে, যখন তা প্রকৃতির সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রেখে পরিচালিত হয়।

অধ্যায় ৩: বিলুপ্তির প্রধান কারণ

আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, মানুষের কর্মকাণ্ডের কারণে বর্তমানে প্রজাতি বিলুপ্তির হার প্রাকৃতিক হারের তুলনায় কয়েকশত গুণ পর্যন্ত বেশি। কিন্তু প্রশ্ন হলো—মানুষ ঠিক কীভাবে এই বিপর্যয় ঘটাচ্ছে?

বিজ্ঞানীদের মতে, কোনো একটি মাত্র কারণ প্রাণী বা উদ্ভিদের বিলুপ্তির জন্য দায়ী নয়। বরং বন ধ্বংস, দূষণ, অতিরিক্ত শিকার, জলবায়ু পরিবর্তন, আগ্রাসী বিদেশি প্রজাতির বিস্তার এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার—এসব একসঙ্গে কাজ করে জীববৈচিত্র্যকে দ্রুত ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে একটি কারণ অন্যটিকে আরও তীব্র করে তোলে।

এই অধ্যায়ে আমরা বিলুপ্তির প্রধান কারণগুলো বিস্তারিতভাবে জানব।

৩.১ বাসস্থান ধ্বংস

বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদের বিলুপ্তির সবচেয়ে বড় কারণ হলো তাদের প্রাকৃতিক আবাসস্থল বা বাসস্থান ধ্বংস হওয়া। প্রতিটি প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য নির্দিষ্ট পরিবেশ, পর্যাপ্ত খাদ্য, নিরাপদ আশ্রয় এবং প্রজননের উপযুক্ত স্থান প্রয়োজন। মানুষ যখন এসব পরিবেশ ধ্বংস করে, তখন সেই প্রজাতির টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে।

বাসস্থান ধ্বংসের প্রধান কারণগুলো হলো—

অভিযোজনের সুযোগ কমে যাওয়া

কৃষিজমি সম্প্রসারণ, গবাদিপশুর খামার, নগরায়ণ, খনিজ উত্তোলন, সড়ক নির্মাণ এবং কাঠ সংগ্রহের জন্য প্রতিদিন পৃথিবীর বিশাল বনভূমি ধ্বংস করা হচ্ছে। বিশেষ করে আমাজন, কঙ্গো ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উষ্ণমণ্ডলীয় বন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত।

ড্রোনচিত্রে দেখা যায়, সবুজ অরণ্যের মাঝখানে বিশাল এলাকা কেটে পরিষ্কার করা হয়েছে।এখানে শুধু গাছই হারিয়ে যায় না; সেই সঙ্গে হাজারো প্রজাতির পাখি, স্তন্যপায়ী প্রাণী, সরীসৃপ, উভচর এবং অগণিত কীটপতঙ্গ তাদের আশ্রয়স্থলও হারিয়ে ফেলে।

জলাভূমি ধ্বংস

নদী, খাল, বিল, হাওর, বাওড় ও জলাশয় অসংখ্য মাছ, উভচর প্রাণী, জলজ উদ্ভিদ এবং পরিযায়ী পাখির আবাসস্থল। কিন্তু আবাসন, শিল্পকারখানা ও অবকাঠামো নির্মাণের জন্য এসব জলাভূমি ভরাট করা হচ্ছে। ফলে জলজ বাস্তুতন্ত্র দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

নগরায়ণ ও অবকাঠামো নির্মাণ

নতুন শহর, মহাসড়ক, রেলপথ, বাঁধ ও বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের ফলে বনভূমি ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয়ে যায়।একে Habitat Fragmentation বা আবাসস্থল বিভক্তকরণ বলা হয়। এতে প্রাণীরা নিরাপদে চলাচল করতে পারে না, জিনগত বৈচিত্র্য কমে যায় এবং সড়ক দুর্ঘটনায় বিপুল সংখ্যক বন্যপ্রাণী মারা যায়।

৩.২ অতিরিক্ত শিকার ও অবৈধ বন্যপ্রাণী বাণিজ্য

মানুষের লোভের কারণে বহু প্রাণী বিলুপ্তির মুখে পৌঁছে গেছে। খাদ্য, বিলাসপণ্য, অলংকার, ঐতিহ্যগত ওষুধ কিংবা পোষা প্রাণীর ব্যবসার জন্য বিশ্বের নানা স্থানে এখনও অবৈধভাবে বন্যপ্রাণী শিকার করা হয়।

হাতির দাঁত

হাতির দাঁত আন্তর্জাতিক বাজারে অত্যন্ত মূল্যবান।শুধুমাত্র দাঁত সংগ্রহের জন্য প্রতি বছর বহু আফ্রিকান ও এশীয় হাতিকে হত্যা করা হয়।

বাঘের চামড়া ও হাড়

কিছু দেশে বাঘের চামড়া, হাড়, দাঁত ও নখের অবৈধ বাজার এখনও রয়েছে। এই শিকার বাঘের সংখ্যা ভয়াবহভাবে কমিয়ে দিয়েছে।

গণ্ডারের শিং

বৈজ্ঞানিকভাবে কোনো ঔষধি গুণ প্রমাণিত না হলেও গণ্ডারের শিংয়ের চাহিদার কারণে আফ্রিকা ও এশিয়ায় বহু গণ্ডার হত্যা করা হয়েছে।

অতিরিক্ত মাছ আহরণ

আধুনিক ট্রলার ও শিল্পভিত্তিক মৎস্য আহরণের ফলে সমুদ্র থেকে এত বেশি মাছ ধরা হচ্ছে যে অনেক প্রজাতি প্রজননের সুযোগই পাচ্ছে না।এর ফলে টুনা, কড, হাঙরসহ বহু সামুদ্রিক প্রাণীর সংখ্যা দ্রুত কমছে এবং পুরো সামুদ্রিক খাদ্যশৃঙ্খল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

৩.৩ দূষণ

দূষণ আধুনিক যুগের সবচেয়ে নীরব কিন্তু ভয়ংকর পরিবেশগত হুমকিগুলোর একটি।মাটি, পানি ও বায়ুর দূষণ অসংখ্য প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনকে বিপন্ন করছে।

প্লাস্টিক দূষণ

প্রতি বছর কয়েক মিলিয়ন টন প্লাস্টিক নদী ও মহাসাগরে পৌঁছে যায়।প্লাস্টিক শত শত বছরেও সম্পূর্ণভাবে পচে না। বড় প্লাস্টিকের পাশাপাশি ক্ষুদ্র মাইক্রোপ্লাস্টিক এখন মাছ, সামুদ্রিক প্রাণী এমনকি মানুষের শরীরেও পাওয়া যাচ্ছে।

সমুদ্রে ভাসমান প্লাস্টিকের ব্যাগ, মাছ ধরার জাল ও অন্যান্য বর্জ্যে কচ্ছপ, ডলফিন, তিমি ও সামুদ্রিক পাখি প্রায়ই আটকে যায়।অনেক প্রাণী এগুলোকে খাবার ভেবে গিলে ফেলে, যার ফলে শ্বাসরোধ, অপুষ্টি কিংবা অভ্যন্তরীণ আঘাতে তাদের মৃত্যু ঘটে।

রাসায়নিক দূষণ

কৃষিতে ব্যবহৃত কীটনাশক, আগাছানাশক ও রাসায়নিক সার বৃষ্টির পানির সঙ্গে নদী ও জলাশয়ে মিশে জলজ প্রাণী, উপকারী অণুজীব এবং কীটপতঙ্গের ক্ষতি করে।শিল্পকারখানা থেকে নির্গত ভারী ধাতুও পরিবেশে দীর্ঘমেয়াদি বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে।

তেল দূষণ

তেলবাহী জাহাজ বা তেলক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটলে সমুদ্রের ওপর তেলের স্তর তৈরি হয়। এতে সূর্যালোক ও অক্সিজেনের প্রবেশ বাধাগ্রস্ত হয়, সামুদ্রিক পাখির পালক নষ্ট হয়ে যায় এবং অসংখ্য মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী মারা যায়।

৩.৪ জলবায়ু পরিবর্তন (Climate Change)

মানুষের কর্মকাণ্ড থেকে নির্গত গ্রিনহাউস গ্যাস পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা দ্রুত বাড়িয়ে দিচ্ছে। এই পরিবর্তন এত দ্রুত ঘটছে যে বহু প্রাণী ও উদ্ভিদ নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না।

এর প্রধান প্রভাবগুলো হলো–

- মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাওয়ায় মেরু ভালুক ও অন্যান্য বরফনির্ভর প্রাণীর আবাসস্থল সংকুচিত হচ্ছে।
- সমুদ্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও অম্লতা বাড়ার কারণে প্রবাল প্রাচীর ধ্বংস হচ্ছে।
- খরা, দাবানল, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা ও তীব্রতা বাড়ছে।
- অনেক পরিযায়ী প্রাণীর স্বাভাবিক প্রজনন ও অভিবাসনের সময়সূচি পরিবর্তিত হচ্ছে।
- উদ্ভিদ ও প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তার দ্রুত বদলে যাচ্ছে।

বিশ্বের প্রায় এক-চতুর্থাংশ সামুদ্রিক প্রজাতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রবাল প্রাচীরের ওপর নির্ভরশীল। তাই প্রবাল ধ্বংস হলে পুরো সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রই হুমকির মুখে পড়ে।

৩.৫ আগ্রাসী বিদেশি প্রজাতি

মানুষ বন, নদী, সমুদ্র ও খনিজ সম্পদ থেকে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি সম্পদ আহরণ করছে।

এর মধ্যে রয়েছে–

- অতিরিক্ত কাঠ সংগ্রহ
- খনিজ ও কয়লা উত্তোলন

- বালু উত্তোলন
- অতিরিক্ত পানি ব্যবহার
- প্রবাল, শামুক ও অন্যান্য সামুদ্রিক সম্পদ সংগ্রহ

এসব কর্মকাণ্ড শুধু সম্পদই কমিয়ে দেয় না, বরং পুরো বাস্তুতন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যক্রমকে ব্যাহত করে।

৩.৭ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ

গত দুই শতাব্দীতে পৃথিবীর জনসংখ্যা অভূতপূর্ব হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৮০০ সালের দিকে বিশ্বের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১০০ কোটি; বর্তমানে তা ৮০০ কোটিরও বেশি। মানুষের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য, পানি, বাসস্থান, জ্বালানি, কাঠ, খনিজ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদাও বহুগুণ বেড়েছে।
এই বাড়তি চাহিদা পূরণ করতে নতুন বনভূমি উজাড় করে কৃষিজমি ও বসতি গড়ে তোলা হচ্ছে, নদী ও জলাভূমি ভরাট করা হচ্ছে, পাহাড় কাটা হচ্ছে এবং সমুদ্র ও বন থেকে আগের তুলনায় অনেক বেশি সম্পদ আহরণ করা হচ্ছে। ফলে অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী তাদের প্রাকৃতিক আবাসস্থল হারাচ্ছে এবং বিলুপ্তির ঝুঁকিতে পড়ছে।

তবে শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধিই এই সংকটের একমাত্র কারণ নয়। সম্পদের অতিরিক্ত ভোগ, অপচয়, অটেকসই উন্নয়ন এবং অসচেতন জীবনযাপনও সমানভাবে দায়ী। তাই জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং দায়িত্বশীল ভোগ নিশ্চিত করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

বিলুপ্তির পেছনে একক কোনো কারণ কাজ করে না।বন উজাড়, দূষণ, অবৈধ শিকার, জলবায়ু পরিবর্তন, আগ্রাসী বিদেশি প্রজাতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার–সব মিলিয়েই আজ পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য অভূতপূর্ব সংকটের মুখে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই কারণগুলোর প্রায় সবই মানুষের সৃষ্টি। তাই সমাধানের চাবিকাঠিও মানুষের হাতেই রয়েছে। আমরা যদি আমাদের জীবনযাত্রা, উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে পারি, তবে এখনও পৃথিবীর অসংখ্য প্রজাতিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব

অধ্যায় ৪: হারিয়ে যাওয়া ও বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী ও উদ্ভিদ

বিলুপ্তির পরিসংখ্যান পড়লে সেগুলো অনেক সময় কেবল সংখ্যা বলেই মনে হয়।কিন্তু প্রতিটি সংখ্যার পেছনে লুকিয়ে থাকে একটি সম্পূর্ণ জীবনের ইতিহাস –একটি প্রজাতির বিবর্তন, টিকে থাকার সংগ্রাম এবং শেষ পর্যন্ত চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার গল্প। পৃথিবীতে এমন অসংখ্য প্রাণী ও উদ্ভিদ ছিল, যাদের আর কখনো জীবন্ত অবস্থায় দেখা যাবে না।আবার এমন বহু প্রজাতি রয়েছে, যারা আজ বিলুপ্তির একেবারে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে।

এই অধ্যায়ে আমরা পরিচিত হব পৃথিবীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিলুপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী এবং উদ্ভিদের সঙ্গে।

৪.১ ইতিমধ্যে বিলুপ্ত প্রাণী

গত কয়েক শতাব্দীতে মানুষের শিকার, বন ধ্বংস এবং পরিবেশগত পরিবর্তনের কারণে বহু প্রাণী পৃথিবী থেকে চিরতরে হারিয়ে গেছে।তাদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ডোডো (Dodo)

ভারত মহাসাগরের মরিশাস দ্বীপের উড়তে অক্ষম এই পাখিটি মানুষের কারণে বিলুপ্তির সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণগুলোর একটি। দ্বীপে কোনো প্রাকৃতিক শিকারি না থাকায় ডোডো মানুষের উপস্থিতিকে ভয় পেত না। ১৭শ শতকে ইউরোপীয় নাবিকদের আগমনের পর নির্বিচারে শিকার এবং মানুষের সঙ্গে আসা ইঁদুর, কুকুর ও শূকরের মাধ্যমে ডিম ধ্বংস হওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যেই ডোডো পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

প্যাসেঞ্জার পিজন (Passenger Pigeon)

একসময় উত্তর আমেরিকার আকাশে বিলিয়ন বিলিয়ন প্যাসেঞ্জার পিজন উড়ে বেড়াত।তাদের ঝাঁক এত বিশাল ছিল যে দিনের বেলাতেও সূর্যের আলো আড়াল হয়ে যেত।কিন্তু উনিশ শতকে বাণিজ্যিক শিকার এবং বন উজাড়ের ফলে এই অবিশ্বাস্য সংখ্যার পাখিও টিকে থাকতে পারেনি। ১৯১৪ সালে চিড়িয়াখানায় থাকা শেষ পাখি 'মার্থা' (Martha) মারা গেলে প্রজাতিটি আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়।

স্টেলার্স সি কাউ (Steller's Sea Cow)

১৭৪১ সালে বিজ্ঞানীরা প্রথম এই বিশাল সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীর সন্ধান পান। দৈর্ঘ্যে প্রায় ৮-৯ মিটার এবং ওজনে কয়েক টন হওয়া সত্ত্বেও প্রাণীটি ছিল অত্যন্ত শান্ত ও ধীরগতির। মাংস, চর্বি ও চামড়ার জন্য অতিরিক্ত শিকারের কারণে মাত্র ২৭ বছরের মধ্যেই, ১৭৬৮ সালে, পৃথিবী থেকে এই প্রজাতি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

শেষ থাইলাসিনের গল্প

থাইলাসিন (Thylacine) বা তাসমানিয়ান টাইগার ছিল ডোরাকাটা দাগযুক্ত এক ধরনের মাংসাশী মারসুপিয়াল। বহু বছর ধরে ভুলভাবে ধারণা করা হতো যে তারা গৃহপালিত ভেড়া হত্যা করে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে তাসমানিয়ার সরকার তাদের হত্যা করলে পুরস্কার দিত।

ফলে হাজার হাজার থাইলাসিন নির্বিচারে মারা হয়।

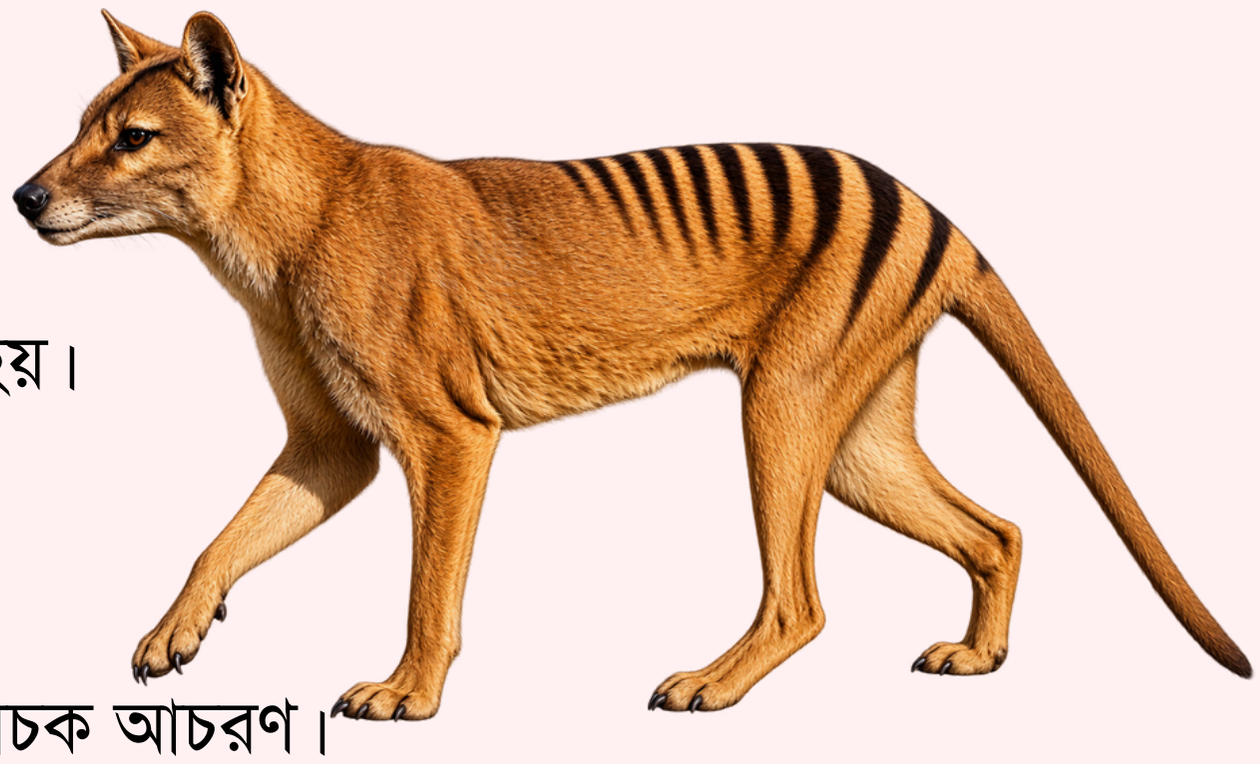

১৯৩৬ সালের ৭ সেপ্টেম্বর হোবার্ট চিড়িয়াখানায় বন্দি অবস্থায় থাকা শেষ পরিচিত থাইলাসিনটির মৃত্যু হয়। সেই দিনই পৃথিবী হারায় একটি অনন্য প্রজাতিকে—যার জন্য দায়ী ছিল মানুষের ভুল সিদ্ধান্ত ও অবিবেচক আচরণ।

৪.২ বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী

আন্তর্জাতিক প্রকৃতি সংরক্ষণ সংস্থা (IUCN)-এর লাল তালিকায় বর্তমানে হাজার হাজার প্রাণী বিপন্ন, অতি বিপন্ন কিংবা মহাবিপন্ন হিসেবে তালিকাভুক্ত। যথাযথ সংরক্ষণ না হলে তাদের অনেকেই ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।

বাঘ

এক শতাব্দী আগে পৃথিবীতে প্রায় এক লাখ বন্য বাঘ ছিল। বর্তমানে সব উপপ্রজাতি মিলিয়ে সংখ্যা পাঁচ হাজারেরও কম।বন উজাড়, অবৈধ শিকার এবং মানুষের সঙ্গে সংঘাতই এর প্রধান কারণ। বালি, জাভা এবং কাস্পিয়ান বাঘ ইতিমধ্যেই বিলুপ্ত।

গণ্ডার

গণ্ডারের শিংকে ঘিরে প্রচলিত অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের কারণে বহু বছর ধরে এদের ব্যাপক শিকার করা হয়েছে। বিশেষ করে জাভান গণ্ডার পৃথিবীর সবচেয়ে বিরল বৃহৎ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের একটি; বর্তমানে এর সংখ্যা মাত্র কয়েক ডজন। সুমাত্রান গণ্ডারও অত্যন্ত সংকটাপন্ন অবস্থায় রয়েছে।

জাভান গণ্ডার

ওরাংওটাং

ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার বোর্নিও এবং সুমাত্রায় বসবাসকারী এই বুদ্ধিমান বনমানুষের প্রধান শত্রুহলো বন উজাড়। পাম অয়েলের বাগান তৈরির জন্য বিপুল পরিমাণ বন ধ্বংস হওয়ায় তাদের আবাসস্থল দ্রুত সংকুচিত হচ্ছে। পাশাপাশি অবৈধ পোষা প্রাণীর ব্যবসাও এদের অস্তিত্বের জন্য বড় হুমকি।

সমুদ্র কচ্ছপ ও উভচর প্রাণী

সামুদ্রিক কচ্ছপ প্লাস্টিক দূষণ, উপকূলীয় উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নিরাপদে ডিম পাড়ার স্থান হারাচ্ছে। অন্যদিকে, বিশ্বের বহু ব্যাঙ ও অন্যান্য উভচর প্রাণী জলবায়ু পরিবর্তন, বাসস্থান ধ্বংস এবং কাইট্রিড (Chytrid) ছত্রাক সংক্রমণের কারণে দ্রুত বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

৪.৩ বিলুপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ

প্রাণীর মতো উদ্ভিদের বিলুপ্তিও সমানভাবে উদ্বেগজনক। কারণ খাদ্যশৃঙ্খল, অক্সিজেন উৎপাদন, মাটির উর্বরতা এবং জলবায়ুর ভারসাম্য–সবকিছুই উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল।

বিরল অর্কিড

বিশ্বের উষ্ণমণ্ডলীয় অরণ্যে হাজার হাজার প্রজাতির অর্কিড জন্মায়। বন উজাড়, অবৈধ সংগ্রহ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অনেক অর্কিড আজ বন্য পরিবেশে টিকে থাকার লড়াই করছে।

মূল্যবান কাঠের গাছ

রোজউড, চন্দন, আবনুস এবং মেহগনির মতো মূল্যবান গাছ অতিরিক্ত কাটার কারণে অনেক এলাকায় দ্রুত কমে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রাকৃতিকভাবে নতুন গাছ জন্মানোর সুযোগও নষ্ট হচ্ছে।

দ্বীপাঞ্চলের স্থানীয় উদ্ভিদ

হাওয়াই, সেন্ট হেলেনা, মাদাগাস্কার এবং গ্যালাপাগোসের মতো বিচ্ছিন্ন দ্বীপে জন্মানো বহু উদ্ভিদ পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। মানুষের আগমন, আগ্রাসী বিদেশি প্রজাতি এবং বন ধ্বংসের কারণে এসব অঞ্চলের বহু উদ্ভিদ ইতিমধ্যেই বিলুপ্ত হয়েছে বা বিলুপ্তির পথে রয়েছে।

৪.৪ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ একটি দেশ হলেও গত কয়েক শতাব্দীতে এখানে বহু প্রাণী ও উদ্ভিদ হারিয়ে গেছে। বন উজাড়, জলাভূমি ধ্বংস, অবৈধ শিকার, দূষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এই সংকট আরও বাড়ছে।

বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত বা স্থানীয়ভাবে বিলুপ্ত প্রাণী

একসময় বাংলাদেশের বন ও তৃণভূমিতে একশৃঙ্গ গণ্ডার, বুনো মহিষ, বার শিঙ্গা (জলের হরিণ), ডোরাকাটা হায়েনা এবং গোলাপি-মাথা হাঁস বিচরণ করত। বর্তমানে এরা বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত বা স্থানীয়ভাবে বিলুপ্ত বলে বিবেচিত। এছাড়া রাজ শকুন, দোয়েল, চড়ুইসহ বেশ কয়েকটি পরিচিত পাখির সংখ্যাও অনেক এলাকায় উদ্বেগজনকভাবে কমে গেছে।

বাংলাদেশের বিপন্ন উদ্ভিদ

বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনের সুন্দরী গাছ দীর্ঘদিন ধরে 'টপ ডাইং' রোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের চিরহরিৎ বন, শালবনের শাল এবং বিভিন্ন দেশীয় বৃক্ষ অবৈধ দখল ও বন উজাড়ের কারণে হুমকির মুখে।
বাংলাদেশের সবচেয়ে বিরল উদ্ভিদগুলোর একটি হলো তালিপাম ।একসময় এটি প্রাকৃতিক পরিবেশে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল বলে ধারণা করা হয়।বর্তমানে সংরক্ষণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সীমিত সংখ্যায় এ প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখা হয়েছে।

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

প্রতিটি বিলুপ্ত প্রজাতি আমাদের জন্য একটি সতর্কবার্তা। ডোডো, থাইলাসিন কিংবা প্যাসেঞ্জার পিজনের মতো প্রাণীরা আর কখনো পৃথিবীতে ফিরে আসবে না। একইভাবে আজকের বাঘ, গণ্ডার, ওরাংওটাং কিংবা সমুদ্র কচ্ছপ–যদি আমরা এখনই তাদের রক্ষা করতে না পারি, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদেরও শুধু বইয়ের পাতায় বা জাদুঘরে দেখতে পাবে।

প্রকৃতি আমাদের অসংখ্য বিস্ময় উপহার দিয়েছে।সেই বিস্ময়গুলো রক্ষা করার দায়িত্বও আমাদেরই।কারণ একটি প্রজাতি হারিয়ে গেলে শুধু একটি প্রাণী নয়, পৃথিবীর ইতিহাসের একটি অপূরণীয় অধ্যায়ও চিরতরে হারিয়ে যায়।

অধ্যায় ৫: জলবায়ু পরিবর্তন ও ভবিষ্যৎ পৃথিবী

আজ ২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে জলবায়ু পরিবর্তনকে আর কেবল ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সংকট বলা যায় না; এটি ইতোমধ্যেই আমাদের বর্তমানের বাস্তবতা। শিল্পবিপ্লবের পর থেকে জীবাশ্ম জ্বালানির অতিরিক্ত ব্যবহার, বন উজাড়, শিল্পকারখানা এবং অনিয়ন্ত্রিত ভোগবাদ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে বিপুল পরিমাণ গ্রিনহাউস গ্যাস জমা করেছে।এর ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ছে এবং জলবায়ুর স্বাভাবিক ছন্দ বদলে যাচ্ছে।

এই সংকটের সবচেয়ে নির্মম দিক হলো–যেসব বন্যপ্রাণী, উদ্ভিদ ও সামুদ্রিক জীব এর জন্য কোনোভাবেই দায়ী নয়, তারাই সবচেয়ে আগে এবং সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অনেক প্রজাতি তাদের আবাসস্থল হারাচ্ছে, খাদ্যের অভাবে মারা যাচ্ছে কিংবা নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে না পেরে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

৫.১ জলবায়ু পরিবর্তনের রূপ ও এর প্রভাব

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন (Global Warming)

কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইডের মতো গ্রিনহাউস গ্যাস পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে তাপ আটকে রাখে। এর ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।এর প্রভাব হিসেবে দেখা যাচ্ছে–

- তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী তাপপ্রবাহ
- অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত
- দীর্ঘমেয়াদি খরা
- শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়
- ঋতুচক্রের পরিবর্তন

এসব পরিবর্তনের ফলে বহু প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনচক্র ব্যাহত হচ্ছে।

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি

অ্যান্টার্কটিকা, গ্রিনল্যান্ড এবং বিশ্বের বিভিন্ন পার্বত্য অঞ্চলের হিমবাহ দ্রুত গলছে।একই সঙ্গে সমুদ্রের পানি উষ্ণ হয়ে প্রসারিত হওয়ার ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এর ফলে–

- উপকূলীয় অঞ্চল প্লাবিত হচ্ছে।
- লবণাক্ততা কৃষিজমি ও মিঠাপানির জলাশয়ে প্রবেশ করছে।
- ম্যানগ্রোভ বন, জলাভূমি এবং উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস হচ্ছে।
- উপকূলের বহু প্রাণী ও উদ্ভিদ তাদের প্রাকৃতিক আবাস হারাচ্ছে।

বাংলাদেশ এই ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম।

দাবানল

উচ্চ তাপমাত্রা ও দীর্ঘস্থায়ী খরার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন বনাঞ্চলে দাবানল বেড়ে যাচ্ছে।

অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, গ্রিস এবং আমাজনের বনাঞ্চলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভয়াবহ দাবানলে–

- কোটি কোটি প্রাণী মারা গেছে,
- হাজার হাজার বর্গকিলোমিটার বন ধ্বংস হয়েছে,
- বিপুল পরিমাণ কার্বন আবার বায়ুমণ্ডলে ফিরে গেছে।

ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের চক্র আরও দ্রুততর হচ্ছে

প্রবাল প্রাচীরের ধ্বংস

সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা বেড়ে গেলে প্রবাল তাদের শরীরে বসবাসকারী উপকারী শৈবাল হারিয়ে ফেলে।তখন প্রবাল সাদা হয়ে যায়, যাকে Coral Bleaching বলা হয়।

প্রবাল প্রাচীর পৃথিবীর সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল।

৫.২ ভবিষ্যতের পৃথিবী: সম্ভাব্য দুটি চিত্র

বর্তমান পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতের পৃথিবী কেমন হতে পারে, সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সম্ভাব্য দৃশ্যপট তৈরি করেছেন।

২০৫০ সালের সম্ভাব্য চিত্র

বর্তমান প্রবণতা অব্যাহত থাকলে–

- বৈশ্বিক তাপমাত্রা প্রাক-শিল্পযুগের তুলনায় প্রায় ১.৫–২° সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।
- বহু অঞ্চলে তাপপ্রবাহ মানুষের বসবাসের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠবে।
- আর্কটিক অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের বরফ প্রায় সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকবে।
- মেরু ভালুক, ওয়ালরাস এবং বরফনির্ভর বহু প্রাণীর অস্তিত্ব মারাত্মক হুমকির মুখে পড়বে।
- পৃথিবীর অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী তাদের বর্তমান আবাসস্থল হারাবে।

২১০০ সালের সম্ভাব্য চিত্র

যদি বৈশ্বিক উষ্ণতা ৩° সেলসিয়াস বা তারও বেশি বৃদ্ধি পায়, তাহলে–

- আমাজনের বিশাল অংশ বন থেকে তৃণভূমিতে রূপ নিতে পারে।
- বিশ্বের বহু উপকূলীয় শহর নিয়মিত জলোচ্ছ্বাস ও প্লাবনের শিকার হবে।
- সমুদ্রের অম্লতা বৃদ্ধি পেয়ে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
- পৃথিবীর বিপুল সংখ্যক প্রাণী ও উদ্ভিদ বিলুপ্ত হতে পারে।
- মানবসভ্যতাও খাদ্য, পানি ও নিরাপত্তা সংকটে পড়বে।

৫.৩ মানুষ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে? (বুমেরাং প্রভাব)

প্রকৃতিকে ধ্বংস করার ফল শেষ পর্যন্ত মানুষের কাছেই ফিরে আসে। একে অনেকেই Boomerang Effect বলে থাকেন।

খাদ্য নিরাপত্তার সংকট

পরাগায়নকারী মৌমাছি, প্রজাপতি ও অন্যান্য পতঙ্গ কমে গেলে বহু কৃষিজ ফসলের উৎপাদন হ্রাস পাবে।একই সঙ্গে সমুদ্রের মাছ কমে গেলে কোটি কোটি মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে।

পানির সংকট

হিমবাহ গলে গেলে প্রথমে নদীতে পানি বাড়লেও পরে দীর্ঘমেয়াদে নদীর প্রবাহ কমে যেতে পারে। ফলে কৃষি, পানীয় জল এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন—সব ক্ষেত্রেই বড় সংকট দেখা দেবে।

স্বাস্থ্যঝুঁকি

উষ্ণ আবহাওয়ার কারণে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য বাহকবাহিত রোগ নতুন নতুন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারে। পাশাপাশি বন উজাড়ের ফলে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংস্পর্শ বাড়ায় নতুন সংক্রামক রোগ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকিও বৃদ্ধি পায়।

অর্থনৈতিক ক্ষতি

ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা ও দাবানলের কারণে প্রতি বছর বিশ্ব অর্থনীতিতে শত শত কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে।কৃষি, মৎস্য, পর্যটন, অবকাঠামো এবং স্বাস্থ্যখাত—সব ক্ষেত্রেই জলবায়ু পরিবর্তনের অর্থনৈতিক প্রভাব ক্রমেই বাড়ছে।

জলবায়ু উদ্বাস্তু

উপকূল ডুবে যাওয়া, মরুকরণ এবং পানির সংকটের কারণে ভবিষ্যতে কোটি কোটি মানুষ নিজ বাসস্থান ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হতে পারে। এটি সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতারও কারণ হয়ে উঠতে পারে।

৫.৪ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। সম্ভাব্য প্রভাবগুলোর মধ্যে রয়েছে–

- উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি।
- সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্যের ওপর মারাত্মক চাপ।
- ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা বৃদ্ধি।
- নদীভাঙন ও জলাবদ্ধতা বৃদ্ধি।
- কৃষি উৎপাদন হ্রাস।
- লাখ লাখ মানুষের বাস্তুচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে অভিযোজনের নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণ কমানো ছাড়া দীর্ঘমেয়াদে এই সংকট মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।

অধ্যায়ের সারাংশ

জলবায়ু পরিবর্তন শুধু পরিবেশগত সমস্যা নয়; এটি জীববৈচিত্র্য, অর্থনীতি, খাদ্য, স্বাস্থ্য এবং মানবসভ্যতার অস্তিত্বের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত একটি বৈশ্বিক সংকট।পৃথিবীর অসংখ্য প্রাণী ও উদ্ভিদ ইতোমধ্যেই এর প্রভাব অনুভব করছে, আর মানুষও এর বাইরে নয়।

প্রকৃতি মানুষকে ছাড়া কোটি কোটি বছর টিকে ছিল এবং ভবিষ্যতেও টিকে থাকতে পারবে।কিন্তু মানুষ প্রকৃতিকে ছাড়া বাঁচতে পারবে না।তাই প্রকৃতিকে রক্ষা করা মানে কেবল বন, নদী বা প্রাণীকে রক্ষা করা নয়–এটি আমাদের নিজেদের, আমাদের সন্তানদের এবং ভবিষ্যৎ মানবসভ্যতাকে রক্ষা করার অঙ্গীকার।

অধ্যায় ৬: সংরক্ষণ ও আমাদের করণীয়

এতক্ষণ আমরা বিলুপ্তি, পরিবেশ ধ্বংস এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু এখানেই গল্পের সমাপ্তি নয়। আশার কথা হলো, মানুষ যেমন এই সংকটের অন্যতম কারণ, তেমনি এর সমাধানের সবচেয়ে বড় শক্তিও মানুষ। বিশ্বজুড়ে সরকার, বিজ্ঞানী, পরিবেশবিদ এবং সাধারণ মানুষ একসঙ্গে কাজ করলে জীববৈচিত্র্যের ক্ষয় অনেকটাই কমানো সম্ভব। প্রকৃতিকে রক্ষা করা আজ আর শুধু পরিবেশপ্রেমের বিষয় নয়; এটি মানবসভ্যতার অস্তিত্ব রক্ষার শর্ত।

৬.১ আন্তর্জাতিক উদ্যোগ ও বৈশ্বিক প্রচেষ্টা

প্রকৃতি কোনো রাষ্ট্রীয় সীমানা মানে না। পরিযায়ী পাখি, নদী, বন কিংবা সমুদ্র—সবই একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত। তাই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সংরক্ষিত বন ও জাতীয় উদ্যান

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বন, পাহাড়, জলাভূমি ও সামুদ্রিক অঞ্চলকে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, যাতে বন্যপ্রাণী মানুষের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিরাপদে বসবাস ও বংশবৃদ্ধি করতে পারে।

বাংলাদেশের সুন্দরবন, লাওয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান এবং কেনিয়ার মাসাই মারা এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

CITES: বন্যপ্রাণী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) হলো একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি, যার লক্ষ্য বিপন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা।

এর মাধ্যমে–

- হাতির দাঁত,
- বাঘের চামড়া,
- গণ্ডারের শিং,
- বিরল অর্কিড,
- মূল্যবান কাঠসহ বহু বিপন্ন প্রজাতির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বীজ ব্যাংক

জলবায়ু পরিবর্তন, যুদ্ধ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যদি কোনো উদ্ভিদ প্রকৃতি থেকে হারিয়েও যায়, তাহলে ভবিষ্যতে যেন তাকে পুনরুদ্ধার করা যায় –সেই উদ্দেশ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বীজ সংরক্ষণাগার গড়ে তোলা হয়েছে।

নরওয়ের স্বালবার্ড গ্লোবাল সিড ভল্ট (Svalbard Global Seed Vault) পৃথিবীর বৃহত্তম বীজভাণ্ডার।এটি উত্তর মেরুর কাছাকাছি স্থায়ীভাবে জমাট বরফের নিচে নির্মিত, যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লাখ লাখ ফসল ও উদ্ভিদের বীজ নিরাপদে সংরক্ষিত রয়েছে।

৬.২ আধুনিক প্রযুক্তির ভূমিকা

প্রযুক্তি একসময় পরিবেশ ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করলেও আজ একই প্রযুক্তি প্রকৃতি সংরক্ষণের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

স্যাটেলাইট ও ড্রোন পর্যবেক্ষণ

স্যাটেলাইট চিত্রের মাধ্যমে প্রতিদিন পৃথিবীর বনাঞ্চল পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে।কোথায় বন উজাড় হচ্ছে, কোথায় দাবানল ছড়াচ্ছে বা জলাভূমি ধ্বংস হচ্ছে–এসব তথ্য দ্রুত জানা যায়।

ড্রোন ব্যবহার করে দুর্গম বনাঞ্চলে–

- বন্যপ্রাণী গণনা,
- চোরা শিকারি শনাক্ত,

- বন অগ্নিকাণ্ড পর্যবেক্ষণ,
- বনায়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন

করা হচ্ছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

বর্তমানে ক্যামেরা ট্র্যাপ, শব্দ শনাক্তকারী সেন্সর এবং স্যাটেলাইট থেকে আসা বিপুল তথ্য বিশ্লেষণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করা হচ্ছে।

AI-এর মাধ্যমে–

- প্রাণীর সংখ্যা দ্রুত গণনা,
- বিরল প্রজাতি শনাক্ত,
- অবৈধ শিকার শনাক্ত,
- বিলুপ্তির ঝুঁকি পূর্বাভাস

দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

ডিএনএ গবেষণা ও জিন সংরক্ষণ

আধুনিক জিন প্রযুক্তির সাহায্যে বিপন্ন প্রাণীর জিনগত বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

এছাড়া বিজ্ঞানীরা De-extinction বা বিলুপ্ত প্রাণীর নিকটবর্তী জিনগত বৈশিষ্ট্য পুনর্গঠনের সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা করছেন।ম্যামথ বা ডোডোর মতো প্রাণীকে সম্পূর্ণভাবে ফিরিয়ে আনা এখনো নিশ্চিতভাবে সম্ভব হয়নি, তবে এই গবেষণা বিপন্ন প্রজাতি সংরক্ষণে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

৬.৩ ব্যক্তি হিসেবে আমাদের করণীয়

বিশ্বকে বদলানোর জন্য সব সময় বড় কোনো উদ্যোগের প্রয়োজন হয় না। কোটি কোটি মানুষের ছোট ছোট সচেতন সিদ্ধান্তও পরিবেশের ওপর বিশাল ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক কমানো

পলিথিন, প্লাস্টিক স্ট্র, প্লাস্টিক কাপ ও বোতলের পরিবর্তে পুনর্ব্যবহারযোগ্য বিকল্প ব্যবহার করুন। বাজারে গেলে কাপড় বা চটের ব্যাগ ব্যবহার করার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

বৃক্ষরোপণ ও স্থানীয় উদ্ভিদ সংরক্ষণ

প্রতি বছর অন্তত একটি দেশীয় প্রজাতির গাছ লাগানোর চেষ্টা করুন। বাড়ির আঙিনা, ছাদ বা বারান্দায় ছোট বাগানও পাখি, মৌমাছি ও প্রজাপতির জন্য নিরাপদ আশ্রয় তৈরি করতে পারে।

বন্যপ্রাণী ও বন্যপ্রাণীর তৈরি পণ্য বর্জন

খাঁচাবন্দী বন্যপাখি, হাতির দাঁত, বাঘের চামড়া, কচ্ছপের খোলস, প্রবাল কিংবা অন্য কোনো বন্যপ্রাণী থেকে তৈরি পণ্য কখনোই কিনবেন না। চাহিদা কমে গেলে অবৈধ শিকারও কমে আসবে।

টেকসই জীবনযাপন

প্রতিদিনের ছোট অভ্যাসগুলো পরিবেশ রক্ষায় বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

- অপ্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ ব্যবহার কমানো।
- পানি অপচয় না করা।
- গণপরিবহন, সাইকেল বা হাঁটার অভ্যাস বাড়ানো।
- Reduce, Reuse, Recycle নীতি অনুসরণ করা।
- অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা কমিয়ে দীর্ঘস্থায়ী পণ্য ব্যবহার করা।

সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া

পরিবার, বন্ধু, বিদ্যালয় এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরুন। সচেতন নাগরিকই একটি পরিবেশবান্ধব সমাজ গড়ে তুলতে পারে।

স্থানীয় সংরক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, নদী পরিষ্কার অভিযান, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ প্রকল্প বা পরিবেশবিষয়ক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া প্রকৃতি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

পরিবার পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন

একটি সুস্থ ও টেকসই ভবিষ্যৎ গড়তে পরিকল্পিত পরিবার, মানসম্মত শিক্ষা এবং নারীর ক্ষমতায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত থাকলে খাদ্য, পানি, ভূমি ও জ্বালানির ওপর চাপও তুলনামূলকভাবে কম থাকে, ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা সহজ হয়।
একই সঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে, শুধু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণই যথেষ্ট নয়। অপ্রয়োজনীয় ভোগ কমানো, খাদ্য ও পানির অপচয় রোধ করা, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার এবং টেকসই জীবনযাপন গ্রহণ করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।কারণ পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে শুধু কত মানুষ আছে তার ওপর নয়, বরং মানুষ কীভাবে এই গ্রহের সম্পদ ব্যবহার করছে তার ওপরও।

৬.৪ ভবিষ্যতের জন্য আমাদের অঙ্গীকার

জীববৈচিত্র্য রক্ষা কোনো একক ব্যক্তি, দেশ বা প্রতিষ্ঠানের কাজ নয়। এটি একটি বৈশ্বিক দায়িত্ব।পৃথিবীর প্রতিটি বন, নদী, সমুদ্র এবং প্রতিটি প্রাণ একে অপরের সঙ্গে অদৃশ্য বন্ধনে যুক্ত।এই বন্ধনের একটি অংশ ছিঁড়ে গেলে তার প্রভাব শেষ পর্যন্ত পুরো পৃথিবীর ওপর পড়ে।
আমাদের আজকের সিদ্ধান্তই নির্ধারণ করবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কেমন পৃথিবী পাবে –সবুজ বন, নির্মল নদী, পাখির গান আর বৈচিত্র্যময় প্রাণে ভরা একটি পৃথিবী, নাকি নীরব, প্রাণহীন এবং দূষণে ভরা এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

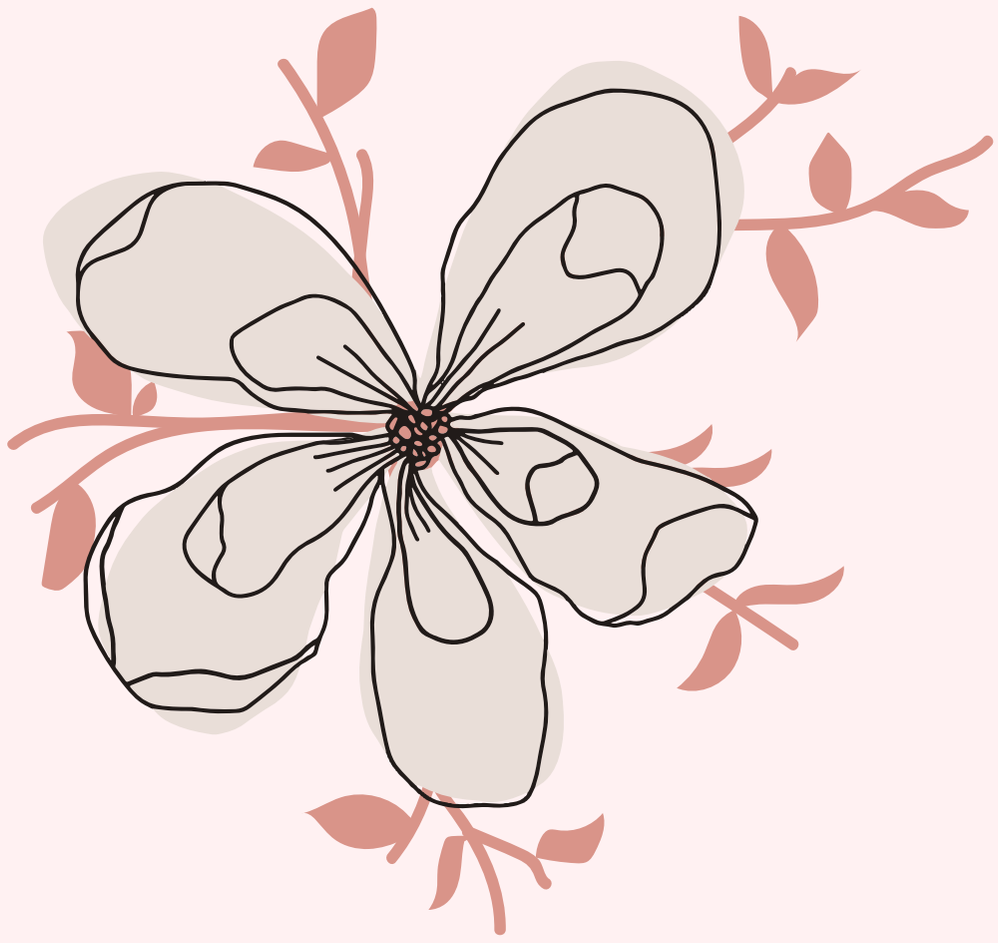

উপসংহার: আমাদের সিদ্ধান্ত, আমাদের ভবিষ্যৎ

পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যের এই দীর্ঘ যাত্রায় আমরা দেখেছি সৃষ্টি, বিবর্তন, বিলুপ্তি এবং মানুষের প্রভাবের ইতিহাস। কোটি কোটি বছর ধরে প্রকৃতি অসংখ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও নিজেকে টিকিয়ে রেখেছে।কিন্তু বর্তমান সংকটটি ভিন্ন –কারণ এই পরিবর্তনের গতি অভূতপূর্ব, আর এর প্রধান চালিকাশক্তি মানুষ নিজেই।

তাহলে প্রশ্ন হলো– **এখনও কি আমাদের হাতে সময় আছে? পৃথিবী কি আবার তার ভারসাম্য ফিরে পেতে পারে?**

উত্তর হলো–হ্যাঁ, এখনও আশা আছে; তবে সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে।

প্রকৃতির অসাধারণ পুনরুদ্ধার করার ক্ষমতা রয়েছে। মানুষ যদি বন ধ্বংস কমায়, দূষণ নিয়ন্ত্রণ করে, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করে এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে আন্তরিকভাবে কাজ করে, তাহলে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত বাস্তুতন্ত্র ধীরে ধীরে পুনরুজ্জীবিত হতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নদী, বন, জলাভূমি ও বিপন্ন প্রাণী পুনরুদ্ধারের বহু সফল উদাহরণ ইতোমধ্যেই প্রমাণ করেছে যে সঠিক উদ্যোগ নিলে ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব।

কোভিড-১৯ মহামারির সময় সাময়িক লকডাউনে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পেয়েছিলাম। মানুষের কর্মকাণ্ড কিছুটা কমে যাওয়ায় অনেক জায়গায় বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণ কমেছিল, কিছু নদীর পানি তুলনামূলকভাবে পরিষ্কার হয়েছিল এবং বন্যপ্রাণীর স্বাভাবিক বিচরণও কিছু এলাকায় বেড়েছিল। যদিও এগুলো ছিল সাময়িক পরিবর্তন, তবু সেগুলো আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে– প্রকৃতিকে সুযোগ দিলে সে নিজেকে পুনর্গঠন করার ক্ষমতা রাখে।

কিন্তু শুধু আশাবাদ যথেষ্ট নয়।প্রয়োজন সচেতন সিদ্ধান্ত, কার্যকর নীতি এবং প্রতিটি মানুষের দায়িত্বশীল আচরণ।পৃথিবীকে রক্ষা করার দায়িত্ব শুধু বিজ্ঞানী, সরকার বা পরিবেশবাদীদের নয়; এটি আমাদের সবার।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের একটি নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে।আমরা তাদের এমন একটি পৃথিবী উপহার দিতে চাই, যেখানে বন থাকবে, নদী থাকবে, পাখির গান থাকবে, প্রজাপতির রঙ থাকবে এবং মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানে বাঁচতে শিখবে।এমন পৃথিবী নয়, যেখানে অধিকাংশ প্রাণীকে কেবল বই, জাদুঘর বা ডিজিটাল পর্দায় দেখা যাবে।

এই বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ের মূল শিক্ষা একটিই–মানুষ প্রকৃতির মালিক নয়; মানুষ প্রকৃতিরই একটি অংশ। প্রকৃতিকে রক্ষা করা মানে মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎকে রক্ষা করা।

আজ আমরা যে সিদ্ধান্ত নেব, আমাদের জীবনযাত্রায় যে পরিবর্তন আনব এবং প্রকৃতির প্রতি যে দায়িত্ব পালন করব, সেটিই নির্ধারণ করবে আগামী শতাব্দীর পৃথিবী কতটা সবুজ, কতটা জীবন্ত এবং কতটা বাসযোগ্য হবে।

শেষ কথা

প্রতিটি বিলুপ্ত প্রজাতির সঙ্গে পৃথিবীর ইতিহাসের একটি অধ্যায় চিরতরে হারিয়ে যায়। আর প্রতিটি সংরক্ষিত প্রজাতি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও অঙ্গীকারের প্রতীক।
প্রকৃতিকে ভালোবাসুন। জীববৈচিত্র্য রক্ষা করুন। কারণ পৃথিবী শুধু মানুষের নয়—এটি সকল জীবের যৌথ আবাস। আজ আমরা প্রকৃতির প্রতি যে দায়িত্ব পালন করব, তার ওপরই নির্ভর করবে আগামী পৃথিবীর সৌন্দর্য, বৈচিত্র্য ও টিকে থাকা।